স্বেচ্ছামৃত্যু এবং 'সান্থারা'

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

বিতর্ক ছিল, চলেই আসছিল । সম্প্রতি এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হল 'সান্থরা'-র হাত ধরে । বিতর্ক কৃপাহত্যা বা নিষ্কৃতি মৃত্যুর (Euthanasia / Mercy killing) আইনি অধিকার প্রসঙ্গে । ইউরোপের অধিকাংশ দেশে পরোক্ষ (passive) কৃপাহত্যা আইনসম্মত । সম্প্রতি আমেরিকাতেও টেরি-র নিষ্কৃতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । অবশ্য এর জন্য টেরি-র পরিবারকে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চালাতে হয়েছিল । আদালত ও আইনসভার অঙ্গনে বারবার আলোচিত হয়ে অবশেষে টেরি-র আবেদনে বৈধতার সিলমোহর পড়ে । আমেরিকাতে শর্তসাপেক্ষে পরোক্ষ কৃপাহত্যা আইনসম্মত হিসেবে পরিগণিত হয় । কিন্তু ভারতে এখনও মধ্যযুগীয় মানসিকতা, অন্ততপক্ষে প্রশাসন এবং বিচার বিভাগীয় স্তরে । কিন্তু উন্নত মানবিক চেতনা থেমে থাকে না, দাবি ওঠে, অধিকার অর্জনের দাবি, অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ।

হায়দ্রাবাদের ২৫ বছর বয়সী বেঙ্কটেশ 'মাসকুলার ডিস্ট্রফি' রোগে আক্রান্ত হয়ে ১০ বছর বয়স থেকেই জীবনদায়ী যন্ত্রের সাহায্যে বেঁচে ছিলেন । দীর্ঘ ১৫ বছর কেটেছিল এভাবেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে । মস্তিষ্ক ছাড়া শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল । বেঙ্কটেশের শেষ ইচ্ছা ছিল যে তাঁর শরীরের সঙ্গে লাগানো জীবনদায়ী যন্ত্রগুলি খুলে দেওয়া হোক এবং তাঁকে শান্তিতে মরতে দেওয়া হোক । বেঙ্কটেশ আরও চেয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অন্য অসুস্থ মানুষদের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হোক । বেঙ্কটেশের এই শেষ ইচ্ছায় সম্মতি দিয়েছিলেন তাঁর মা সুজাতাও, যিনি ছিলেন অসুস্থ পুত্রের আমৃত্যু সঙ্গী । কিন্তু বেঙ্কটেশ ও সুজাতার আর্জি খারিজ করে দেয় অন্ধ্র হাইকোর্ট এই যুক্তিতে যে নিষ্কৃতি মৃত্যু এদেশে আইনসম্মত নয় এবং স্বাভাবিক মৃত্যু বা মস্তিষ্কের মৃত্যু না ঘটলে শরীর থেকে অঙ্গ বার করা যায় না । অবশ্য এর কয়েকদিন পরেই বেঙ্কটেশের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং তার চোখ দুটি একজন অন্ধ ব্যক্তির চোখে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় । ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪-এ বেঙ্কটেশের জীবনাবসান ঘটে ।

পাঁচ বছর ধরে কোমায় আচ্ছন্ন বিহারের হতদরিদ্র দলিত পরিবারের গৃহবধূ কাঞ্চন দেবী । তাঁর পিতার ভাষায় 'জীবন্ত লাশ'। কাঞ্চন-এর চিকিৎসার জন্য এই পরিবারটির সবকিছু গেছে । পাটনা হাইকোর্ট এবং বিহারের রাজ্যপালের কাছে কাঞ্চন-এর পরিবারের আবেদন ছিল তার নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার প্রদান । না, সম্মতি মেলেনি । কারণ আইনি বাধা । এপ্রিল ২০০৫-এর ঘটনা ।

অতি সম্প্রতি (অক্টোবর ২০০৬) নিষ্কৃতি মৃত্যু বিতর্কে নতুন এবং স্বতন্ত্র মাত্রা যুক্ত করেছে রাজস্থানে তিনজন জৈন ধর্মাবলম্বীর 'সান্থারা' পালনের মাধ্যমে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ । জয়পুরের বিমলা দেবী (৬২), অজমেরের অমরচন্দ্র (৭৭) এবং হনুমানগড়ের সরদারি দেবী (৯৪), প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন রোগভোগ করছিলেন । জৈন ধর্মাচার সান্থারার নিয়ম মেনে অন্নজল পরিত্যাগ করে তিনজনই মৃত্যুবরণ করেন । বলাবাহুল্য, মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে তিনজনের একইভাবে মৃত্যুর ঘটনা নিষ্কৃতি মৃত্যুর বিতর্কটিকে নতুনভাবে উসকে দিয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই তিনজনের মৃত্যু কিন্তু স্বতন্ত্র ধরণের নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার প্রার্থনা করে । তাঁরা আদালত বা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন নি, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজেরাই এবং সেই মোতাবেক কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন ও তা অনুসরণ করেছেন অর্থাৎ অন্নজল পরিত্যাগ করেছিলেন । মৃত্যুকে প্রাপ্তির জন্য তাঁদের কারও সাহায্য-প্রত্যাশী হওয়ার প্রয়োজন হয় নি যা বেঙ্কটেশ কিংবা কাঞ্চন-এর ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল । সিদ্ধান্ত যেহেতু নিজস্ব তাই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার দায়ও নিজের । এদিক থেকেও বেঙ্কটেশ ও কাঞ্চন-এর সঙ্গে একধরণের মূলগত ফারাক । মৃত্যু কামনা করা এবং সেই কামনা বাস্তবায়িত করা এক জিনিষ নয় । বেঙ্কটেশও মৃত্যুকে কামনা করেছিল কিন্তু সেই মৃত্যুকে বাস্তবায়িত করার মত সামর্থ্য তার নিজের ছিল না, প্রয়োজন ছিল অন্য কোনও ব্যক্তির সক্রিয়তা যথা ডাক্তার বা অন্য কেউ যদি করুণাবশত তার শরীরের সঙ্গে যুক্ত জীবনদায়ী যন্ত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেন । কিন্তু সান্থারার ক্ষেত্রে এরকম কোনও অন্য ব্যক্তির

সক্রিয়তার প্রয়োজন হয় না । এখান থেকেই উৎপত্তি ঘটেছে আরও এক নতুন বিতর্কের । প্রশ্ন উঠছে যে স্বতন্ত্র ধর্মাচারের আড়ালে কি আসলে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে নেওয়া হচ্ছে ? যদি তাই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে নৈতিকতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলার দিক দিয়ে তা কতখানি যুক্তিযুক্ত ?

সান্থারার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে রাজস্থান হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে । সেখানে আবেদন করা হয়েছে যে এই প্রথা আত্মহত্যা বা সতী হওয়ার সামিল যা ভারতীয় দন্ডবিধিতে নিষিদ্ধ । অতএব অবিলম্বে সান্থারা নিষিদ্ধ হোক ।

জনস্বার্থ মামলা চলুক, বিতর্কও চলুক, আমরা বরং বর্তমান পরিসরে এ সংক্রান্ত কয়েকটি দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে পারি ।

অনারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত জর্জরিত জীর্ণ দেহ, প্রতি মুহুর্ত্তের সঙ্গী অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণা, এই অবর্ণনীয় দুঃসহ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্রই পথ মৃত্যুর শান্ত শীতলতা -- নিস্কৃতি মৃত্যুর ভাব বা ধারণা এমন কথাই বলে । মৃত্যু এক্ষেত্রে কাম্য, কাঙ্খিত , কিন্তু কোনও অবস্থাতেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয় । উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল যন্ত্রণার অবসান । একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই সেই লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে পৌছোনো যেতে পারে । একটু ভিন্নভাবে কথাটিকে এভাবে বলা যেতে পারে যে যদি অন্য কোনও পন্থায় ব্যক্তিকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হত তাহলে নিস্কৃতি মৃত্যু কাঙ্খিত হত না । অর্থাৎ উপযুক্ত বিকল্পের অভাব বা অনুপস্থিতি-ই কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিস্কৃতি মৃত্যুকে অপরিহার্য রূপে চিহ্নিত করে । তবে উল্লেখিত তিন জৈন ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় বিশ্বাস । জৈনমতে এভাবে অন্নজল ত্যাগ করে মৃত্যুতে মোক্ষলাভ সম্ভব । সেকারণেই সান্থারার সপক্ষে জৈনধর্মের নেতারা সাফাই গেয়ে বলেছেন যে এভাবে মৃত্যুবরণ নিস্কৃতি মৃত্যু রূপে পরিগণিত হয় না । সান্থারা নির্বাণের উপায় । এর মধ্যে আপত্তির কিছু নেই । তবে মনে রাখতে হবে যে সান্থারার মাধ্যমে সম্প্রতি যে তিনজন মৃত্যুবরণ করেছেন তারা প্রত্যেকেই অনারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন ।

ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানে নিস্কৃতি মৃত্যু বা কৃপাহত্যা নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্ক আছে । সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তির ঘনঘটায় কোনও একমাত্রিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় না । এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেই বলা যায় যে সান্থারাকে যথার্থ অর্থে কৃপাহত্যা বা নিস্কৃতি মৃত্যু বলা যায় না, অন্ততপক্ষে চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানে কৃপাহত্যা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সান্থারা সেই অর্থে কৃপাহত্যার সমতুল্য নয় ।

স্বেচ্ছামৃত্যু, কৃপাহত্যা এবং আত্মহত্যা

কৃপাহত্যা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল ‘সুন্দর বা শান্তিপূর্ণ মৃত্যু’। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানে কৃপাহত্যা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । কৃপাহত্যার ধারণার মধ্যে একটি বিশেষ ভাব আছে তা হল এই হত্যা সমবেদনা বা সহানুভূতি থেকে উৎপন্ন । এই হত্যার মাধ্যমে যাকে হত্যা করা হয় তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় । এখানে হত্যা অশুভ নয়, মঙ্গলজনক । একজন ব্যক্তি যদি (কৃপা)হত্যার ফলে দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করে তাহলে সেই হত্যা তার পক্ষে মঙ্গলজনক রূপেই পরিগণিত হয় । যদি কোনও ব্যক্তি এমন এক রোগে আক্রান্ত হয় যা চূড়ান্ত কষ্টদায়ক এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে রোগের নিরাময় বা উপশম অসম্ভব তাহলে সেই রোগের থেকে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুই একমাত্র পথ । এই মানুষটির জীবনকে নানান ওষুধ ও জীবনদায়ী বাবস্থার সাহায্যে হয়ত দীর্ঘায়িত করা যায় কিন্তু তার ফলে তার যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ীই হয় । এই জাতীয় ক্ষেত্রে কৃপাহত্যাই কাম্য বলে মনে হয় । কৃপাহত্যার সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য নিহিত এখানেই । অর্থাৎ অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যন্ত্রণা জর্জরিত ব্যক্তির যন্ত্রণা উপশমের জন্য তাকে হত্যা

করা বা মৃত্যু সংঘটনে সহায়তা করা । বলাবাহুল্য এই সহায়তার কাজ করতে সক্ষম একমাত্র চিকিৎসক, অন্য কোনও ব্যক্তি নয় । একারণেই বেঙ্কটেশ ও তার মা সুজাতা চিকিৎসকের কাছে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ।

অন্যদিকে আত্মহত্যা বলতে বোঝায় : 'যদি কোনো ব্যক্তি এমন একটি পরিস্থিতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবনের সমাপ্তি ঘটায় যেখানে অন্য কেউ তাকে সেই কাজ করতে বাধ্য করেনি এবং যেখানে এমন একটি পরিস্থিতি ঘটে যে পরিস্থিতি সেই ব্যক্তির মৃত্যুর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত'। ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে আত্মহত্যা করতে পারে, করেও থাকে , যথা প্রেমে ব্যর্থতা, পরীক্ষায় মনোমত ফল না হওয়া , বেকারত্ব , আর্থিক অনটন, পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক সম্মানহানি, প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বেদনা ইত্যাদি ইত্যাদি । আত্মহ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এ জাতীয় মৃত্যু রচনার ক্ষেত্রে অন্য কোনও ব্যক্তির সহায়তা বা সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না । নিজের মৃত্যু ঘটানোর মত সক্রিয়তা বা সামর্থ্য ব্যক্তির থাকে । বেঙ্কটেশ এ কারণেই আত্মহননের মাধ্যমে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে নি, পক্ষান্তরে জৈন ধর্মাবলম্বী তিনজন অন্নজল স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

স্বেচ্ছামৃত্যু ভাব বা ধারণার দিক থেকে কৃপাহত্যার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ আবার পন্থা বা মাধ্যমের দিক থেকে আত্মহত্যার সদৃশ । যে ব্যক্তি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করছেন তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল ব্যাধি জর্জরিত শরীরের দুঃসহ যন্ত্রণা এবং ক্লেশ থেকে মুক্তিলাভ । সেদিক থেকে কৃপাহত্যার মূলভাবের সঙ্গে এর সঙ্গতি রয়েছে । কিন্তু এই লক্ষ্যে বা উদ্দেশে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁকে অন্য কোনও ব্যক্তির সহায়তার প্রত্যাশী হয়ে থাকতে হচ্ছে না, কাউকে 'হত্যাকারী' রূপে সমাজের চোখে পরিগণিত হতে হচ্ছে না, ব্যক্তি নিজেই মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছেন । এক্ষেত্রে দড়ির ফাঁস কিংবা বিষের ছোঁয়ার মত একলহমায় মৃত্যু আসে না । মৃত্যু আসে ধীরে ধীরে । এখানেই পরীক্ষা ব্যক্তির মানসিকতার, ব্যক্তিত্বের, ধৈর্য ও দৃঢ়তার । এ জাতীয় মৃত্যুকে তাই জীবন থেকে ভীরুর মত পলায়ন বলা যায় না, বরং সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ মৃত্যুর দিকে, মৃত্যুর লক্ষ্যে ।

সান্থারার মধ্যে যে ধর্মীয় ভাব বা ভাবনাটুকু আছে সেটুকু বাদ দিলে তা অবিকল স্বেচ্ছামৃত্যুর সমতুল্য । কৃপাহত্যা নয়, স্থূল অর্থে আত্মহত্যাও নয়, এ হল ইচ্ছামৃত্যু । রাজপুত রমণীদের জহর ব্রত কিংবা যতীন দাস-এর কারাগারে আমৃত্যু অনশন -- কোনকিছুর সঙ্গেই স্বেচ্ছামৃত্যুর তুলনা করা যায় না । এ কারণেই বলা যেতে পারে এ এক স্বতন্ত্র ধরণের মৃত্যু ।

স্বেচ্ছামৃত্যুকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য রূপে গণ্য করা যেতে পারে । 'জীবন স্বতঃ মূল্যবান' শুধুমাত্র এই যুক্তিতে জীবন্ত লাশ বা উদ্ভিদের মত বেঁচে থাকাকে সমর্থন করার কোনও যৌক্তিকতা নেই । জীবনের অধিকার ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় এবং যুক্তিগ্রাহ্য কারণে পরিত্যাগ করে তাহলে তাকে নীতিবিগর্হিত রূপে গণ্য করার ক্ষেত্রে কোনও যৌক্তিকতা নেই । জীবনের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ যদি থাকে তাহলে স্বেচ্ছামৃত্যুকে সমর্থন করা উচিত , কারণ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মানবশতই ব্যক্তি স্বেচ্ছামৃত্যুর মাধ্যমে নিজের জীবনকে সম্মানিত করছে যে জীবন একদা ছিল তার কাছে মূল্যবান ।

ইচ্ছামৃত্যুর অধিকার আইনসম্মত হলে তার অপব্যবহার ঘটবে এমন অভিযোগ অবশ্যই ওঠে এবং উঠেছেও । কিন্তু মনে হয় এই অভিযোগ অমূলক । কারণ ইচ্ছামৃত্যুকামী ব্যক্তি তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সময় ও সুযোগ পায় যা কৃপাহত্যা এবং আত্মহত্যার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ।

ইচ্ছামৃত্যুর যৌক্তিকতাকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে । রোগী অত্যন্ত সচেতনভাবে উপলব্ধি করছে যে সে পরিবার তথা সমাজের বোঝা স্বরূপ এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে । তার উপলব্ধিতে এই অর্থ ব্যয় অকারণ এবং অনুচিত । সে যতদিন বাঁচবে

সমাজের বোঝা হয়েই বেঁচে থাকবে এবং সামাজিক সম্পদের অপচয় ঘটেই চলবে । রোগী স্পষ্টভাবে একথা উপলব্ধি করে যে তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছে, সমাজকে দেওয়ার মত তার আর কিছু নেই । থাকলেও সক্ষমতা নেই বা সক্ষমতা ফিরে আসার ন্যূনতম সম্ভাবনা নেই । সবচেয়ে বড় কথা রোগী তার জীবনাবসানের জন্য এমন কোনও পন্থা বা উপায় গ্রহণ করছেন যা অস্বাভাবিক মানসিকতার পরিচায়ক যা অশুভ সামাজিক দৃষ্টান্ত রূপে চিহ্নিত হয় । সে চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করে এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে বিরত থেকে শান্তভাবে মৃত্যুকে আহ্বান জানাচ্ছে । বলাবাহুল্য এভাবে মৃত্যু বরণের জন্য যথেষ্ট মানসিক দৃঢ়তা ধৈর্য সংযম এবং সময়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় । কারণ এক্ষেত্রে মৃত্যু একলহমায় আসে না, আসে ধীরে ধীরে যা সময়সাপেক্ষ ।

যে রোগী শুধুমাত্র প্রাণে বেঁচে আছেন এবং অসহনীয় যন্ত্রণাভোগ করে চলেছেন দিনের পর দিন সর্বোপরি যিনি আর বাঁচতে চান না, এমন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে জোর করে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা কতদূর যুক্তিসংগত ? দীর্ঘদিন ধরে ব্যয়বহুল চিকিৎসার বোঝা টানতে গিয়ে বহুক্ষেত্রেই রোগীর পরিবার শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থার মুখোমুখি হয় । রোগীর মৃত্যু একসময় স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে । কিন্তু ততদিনে গোটা পরিবার হয়তো আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে পড়ে ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো বটেই ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ইচ্ছামৃত্যুর বিষয়টি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের নৈতিকতার সঙ্গে এর কোনও বিরোধিতার সম্পর্ক নেই, সর্বোপরি মানবাধিকারের সঙ্গেও বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ । মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি কী উপায়ে মারা যাবে তা বেছে নেওয়ার অধিকার তার নেই, কিন্তু চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার আছে । রোগী যদি চিকিৎসা নিজে অস্বীকার করে তাহলে তাকে জোর করা যাবে না । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন আছে । রোগীর সম্মতি ছাড়া ডাক্তার যদি জোর করে তার চিকিৎসা করেন তাহলে তা অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করার অপরাধ রূপে গণ্য হয় । এদেশের পটভূমিকায় ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষেত্রে ধর্মীয় ট্যাবু নিশ্চয়ই বাধা হয়ে দাঁড়াবে । কিন্তু উদার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুমুখী মানুষদের কথা ভাবার সময় নিশ্চয়ই এসেছে ।

পরিশেষে আর একটি কথা উল্লেখ না করলে বোধহয় আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে । এ দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার যথাযথ সুযোগ কয় শতাংশ মানুষ পান ? ন্যূনতম পথ্য পান কয় শতাংশ রোগী ? এই প্রেক্ষিতে যদি বলা হয় যে এদেশের এক বিপুল সংখ্যক অসুস্থ মানুষ পরিপূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বেচ্ছামৃত্যুর অসহায় শিকার হচ্ছেন, হতে বাধ্য হচ্ছেন, তাহলে কী অত্যুক্তি করা হবে ? এদেশের ধনী বা উচ্চবিত্ত পরিবার যারা এরকম মৃতপ্রায় রোগীর ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ দীর্ঘদিন ধরে বহন করতে সক্ষম তাঁদের কথা তোলা হচ্ছে না । কিন্তু নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের এরকম অসুস্থ রোগীদের নিয়ে ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বলেই আমাদের মনে হয় । অন্তত এইদিক থেকে ইচ্ছামৃত্যুর আইনি স্বীকৃতি অপরিহার্য এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে ।

সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা -- ১০।১০।০৪, ১৬।১২।০৪, ১৮।১২।০৪, ১০।৪।০৫, ৮।১০।০৬